উপরোক্ত কথাটি বলেছিল। এমনিভাবে 'সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে' কথাটিও জনগণের কাছে আস্ফালন প্রকাশার্থ বলেছিল, যদিও সে ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপছিল।) মূসা [(আ) একথা মুখোমুখি অথবা পরোক্ষভাবে শুনে] বললেন, আমি আমার ও তোমাদের (অর্থাৎ সকলের) পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি এমন প্রত্যেক অহংকারীর অনিষ্ট থেকে, যে হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না। (তাই সত্যের মুকাবিলা করে। মজলিসে) ফেরাউন পরিবারের এক মু'মিন ব্যক্তি ছিল। সে (এ পর্যন্ত) তার ঈমান গোপন রাখত, (পরামর্শ শুনে) সে বলল, তোমরা কি একজনকে (কেবল) এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ্।' অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে (আপন দাবির স্বপক্ষে) স্পষ্ট প্রমাণসহ আগমন করেছে? (অর্থাৎ সে নবুয়ত দাবির সত্যতা প্রতিপন্নকারী মু'জিযা প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় তার বিরোধিতা করে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা খুবই অশোভন।) আর ধরে নাও যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে-ই দায়ী হবে, (এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে নিজেই লাঞ্ছিত হবে---হত্যা করার প্রয়োজন নেই।) আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করছে, (অর্থাৎ ঈমান না আনলে আযাব হবে) তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে। (এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে আরও বেশি বিপদ ডেকে আনা হবে। সারকথা, তার মিথ্যাবাদিতার ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা বৃথা। আর সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা ক্ষতিকর। নিয়ম এই যে,) আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীর অভীষ্ট পূর্ণ করেন না। [অর্থাৎ ক্ষণকালের জন্য তার প্রভাব বিস্তার সম্ভব হলেও পরিণামে তার ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। সুতরাং মূসা (আ) মিথ্যাবাদী হলে তাকে ধ্বংস না করা মানুষকে সন্দেহে ও বিভ্রান্তিতে পতিত করার নামান্তর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করতে পারেন না। তাই আল্লাহ্র কাছে তার পরাভূত ও লাঞ্ছিত হওয়া জরুরী। সুতরাং তাকে হত্যা করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে তিনি সত্যবাদী হলে তোমরা নিশ্চিতই মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদিতার সীমালংঘনকারী। এরূপ ব্যক্তি সফলকাম হতে পারে না। সুতরাং তোমরা তাকে হত্যা করতে সফল হবে না। সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা না করাই প্রতিপন্ন হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কি কোন দুষ্কৃতকারীকেই হত্যা করা যাবে না? জওয়াব এই যে, যেখানে সত্যবাদী হওয়া অথবা মিথ্যাবাদী হওয়া সন্দেহাতীত নয়, সেখানেই একথা প্রযোজ্য। যেক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত, সেখানে প্রযোজ্য নয়। তবে মূসা (আ) যে সত্যবাদী, এ বিষয়ে মু'মিন লোকটির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু জনসাধারণকে চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সে এভাবে কথা বলেছিল। এরপরও এই হত্যা থেকে নিবৃত্ত রাখার বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে।] হে আমার ভাইয়েরা, আজ তো তোমাদেরই রাজত্ব, এদেশে তোমরাই শাসক; কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন (একথা শুনে) বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাব (যে, তার হত্যাই সমীচীন।) আর আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথই দেখাই। মু'মিন ব্যক্তি (নরম উপদেশে কাজ হবে না দেখে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করে) বলল,

ভাইসব, আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের অনুরূপ দুদিনের আশংকা করছি। যেমন, কওমে নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করার ইচ্ছা করেন না। (কিন্তু তোমরা মন্দ কাজ করলে তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে। এটা ইহলৌকিক আযাবের ভয় প্রদর্শন, অতপর পারলৌকিক আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে---) ভাইসব, তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি (অর্থাৎ সেদিন বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটবে। একে অপরকে বেশি পরিমাণে ডাকাডাকি করা বিরাট ঘটনার মধ্যে থাকে। সেদিন সর্বপ্রথম শিংগা ফুঁকার আওয়াজ হবে। এতে সব মৃত জীবিত হবে। আল্লাহ্ বলেনঃ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ আরেক ডাক হবে হিসাবের জন্য। আল্লাহ্ বলেনঃ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ---(আরেক ডাকাডাকি হবে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে। আল্লাহ্ বলেনঃ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ---وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ---অবশেষে মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে যবেহ করার সময় হবে এক ডাক। হাদীসে আছেঃ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ) যেদিন তোমরা (হিসাবের জায়গা থেকে) পেছন ফিরে (জাহান্নামের দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে, (তখন) আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁর আযাব) থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। (কাজেই এখনই তোমাদের হেদায়েত কবুল করা উচিত ছিল, কিন্তু) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ (আ) তওহীদ ও নবুয়তের) স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ আগমন করেছিলেন (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ কিবতী সম্প্রদায়ের কাছে এসেছিলেন, যাদের খবর ব্যক্তি পরম্পরায় তোমাদের কাছে পৌঁছেছে।) অতপর তোমরা তাঁর আনীত বিষয়ে সন্দেহই করেছিলে। অবশেষে যখন তিনি লোকান্তরিত হলেন, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্ ইউসুফের পর আর কাউকে রসূল রূপে প্রেরণ করবেন না। (দুষ্টামির ছলে একথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমত ইউসুফও রসূল ছিলেন না। থাকলেও আমরা একজনকে যখন মানিনি তখন আল্লাহ্ বলবেন, আরেক জনকে পাঠিয়ে কি লাভ। ফলে ব্যাপার চিরতরে চুকে গেছে। এর আসল উদ্দেশ্য রিসালত অস্বীকার করা। এ ব্যাপারে তোমরা যেমন ভ্রান্ত) এমনিভাবে আল্লাহ্

তা'আলা সীমালংঘনকারী ও সংশয়ীদেরকে ভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন। যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও মু'মিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক (তোমাদের অন্তরে যেমন মোহর এঁটে দিয়েছেন)। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (ফলে তাদের মধ্যে সত্যকে অনুধাবন করার অবকাশ থাকে না। ফেরাউন পরিবারের মু'মিন ব্যক্তির এই বিবৃতির ফলে তার ঈমান আর গোপন থাকেনি) ফেরাউন (এই অকাট্য বিবৃতির জওয়াব দানে অক্ষম হয়ে পূর্ববৎ মূর্খতা অনুযায়ী দলীল কায়েম করার জন্য হামানকে) বলল, হে হামান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। (আমি তাতে আরোহণ করে দেখব) হয়তো (এভাবে) আমি আকাশে যাওয়ার পথে পৌঁছে যেতে পারব, অতপর (সেখানে গিয়ে) মূসার আল্লাহ্‌কে দেখব। আর আমি তো তাকে (তার দাবিতে) মিথ্যাবাদীই মনে করি। এমনিভাবে ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছিল, তার (অন্যান্য) মন্দ কর্মকেও এবং সোজা পথ থেকে সে বিরত হয়েছিল। [সে মূসা (আ)-র মুকাবিলায় অনেক চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু] ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্তই ব্যর্থ হয়েছে। (কোনটিই সফল হয়নি)। মু'মিন লোকটি (সদুত্তর দানে ফেরাউনকে অক্ষম দেখে পুনশ্চ) বলল, ভাইসব, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। (অর্থাৎ ফেরাউন প্রদর্শিত পথ সৎপথ ও হেদায়েত নয়; বরং আমি যে পথের সন্ধান দিচ্ছি, তা-ই সৎপথ।) ভাইসব, এই পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। আর পরকাল স্থায়ী বসবাসের জায়গা। (সেখানে প্রতিফল দেওয়ার রীতি এই যে) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পায়, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেখানে তাদেরকে বেহিসাব রিযিক দেওয়া হবে। (এই বিবৃতিদানের সময় মু'মিন ব্যক্তি অনুভব করল যে, প্রতিপক্ষ তার কথায় বিস্ময়বোধ করছে এবং তার কথা মেনে নেয়ার পরিবর্তে তাকেই কুফরের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তাই সে আরও বলল) ভাইসব, ব্যাপার কি, আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে; আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং এমন বস্তুকে তার সাথে শরীক করি, যার (শরীক হওয়ার) কোন দলীল আমার কাছে নেই। আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে। স্বতঃসিদ্ধ যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, সে (কোন জাগতিক অভাব পূরণের জন্য) দুনিয়াতেও ডাকার যোগ্য নয় এবং (আযাব দূর করার জন্য) পরকালেও (ডাকার যোগ্য নয়।) (নিশ্চিত যে,) আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র দিকে; আর যারা (দাসত্বের) সীমালংঘন করে, (যেমন মুশরিক) তারা সবাই জাহান্নামী। (এখন তো আমার কথা তোমাদের মনে ভাল লাগে না, কিন্তু) ভবিষ্যতে একদিন তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে। (মু'মিন ব্যক্তি পূর্ব থেকেই আশংকা করছিল যে, এই উপদেশের কারণে তারা তার বিরোধী হয়ে যাবে এবং নির্যাতন করবে। তাই সে আরও বলল,) আমি আমার ব্যাপার

আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সব বান্দার (নিজেই) রক্ষক। (আমি তোমাদেরকে মোটেই ভয় করি না)। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (মু'মিন ব্যক্তিকে) তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন (সেমতে সে তাদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পেল। হযরত কাতাদাহ্ বলেন, তাকেও মূসা (আ)-র সাথে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়। ---(দুররে মনসূর) এবং ফেরাউন গোত্রকে (ফেরাউন সহ) শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (তা এই যে,) সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় (এবং বলা হয়, তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন এতে দাখিল করা হবে) এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে (ফেরাউনসহ) কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফেরাউন বংশীয় মু'মিন ঃ উপরে স্থানে স্থানে তওহীদ ও রিসালত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফিরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লিখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য উপরোক্ত প্রায় দু'রুকূতে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আ)-র মু'জিযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মুকাতিল, সুদ্দী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ইনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে মূসা (আ)-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মূসা (আ)-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ

এই মু'মিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ 'হাবীব' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবীব সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সোহায়লীর মতে এই মু'মিন ব্যক্তির নাম 'শামআন'। কেউ কেউ তার নাম 'হিযকীল' বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মাত্র। একজন সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাজ্জার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় মু'মিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় হযরত আবু বকর (রা)। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ।---(কুরতুবী)

يَكْتُمُ إِيمَانَهٗ —এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মু'মিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোরআন—হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত কেউ মু'মিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরী নয়। এর প্রয়োজন কেবল এজন্য যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যবহার করতে পারবে না।—(কুরতুবী)

ফেরাউন গোত্রের মু'মিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরাউন ও ফেরাউন পরিবারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মূসা-হত্যার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখেন।

يٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ — تَنَادِ। এটা تَنَادِى-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থ একে অপরকে ডাক দেয়া। কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি হবে বলে একে يَوْمَ التَّنَادِ বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ্ বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক। এতে তকদীর অস্বীকারকারীদেরকে বোঝানো হবে। অতপর জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতী ও আ'রাফবাসীদেরকে ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার নামসহ ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছে। এরপর সে কোনদিন হতভাগা হবে না এবং অমুকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়েছে, অতপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে না। (মাযহারী) মসনদে বাযযার ও বায়হাকীতে বর্ণিত হযরত আনাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল ওজনের পর হবে।

হযরত আবূ হাযেম আ'রাজ (রা) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আ'রাজ, কিয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে। আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তখনও দণ্ডায়মান হবে। আমি মনে করি প্রত্যেক গোনাহের ঘোষণার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ, তুমি সর্বপ্রকার গোনাহ্ই সঞ্চয় করে রেখেছ।—(মাযহারী)

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ—অর্থাৎ তোমরা যখন পেছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন করবে। তফসীরের সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সারমর্ম এই যে, উপরে يوم التناد—এর তফসীরে উল্লিখিত ঘোষণাবলী সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা। যখন প্রথম ফুঁক দেওয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোন পথ থাকবে না। তাদের মতে يوم التناد বলতে প্রথম ফুঁকের সময় বোঝানো হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে আর্ত চীৎকার শোনা যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্হাক থেকে বর্ণিত আয়াতের অপর কিরাত يَوْمَ التَّنَادِّ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটা نَدٌّ ধাতু থেকে উদ্গত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তফসীর অনুযায়ী يوم التناد-এর অর্থও পলায়নের দিন এবং تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ-এরই ব্যাখ্যা।

তফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র এক দীর্ঘ হাদীসে কিয়ামতের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুঁকের ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে 'নফখায়ে ফাযা' বলা হয়। দ্বিতীয় ফুঁকের ফলে সবাই বেঁহুশ হয়ে মারা যাবে। একে 'নফখায়ে ছা'ক' বলা হয়। তৃতীয় ফুঁকের ফলে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নফখায়ে নশর' বলা হয়। প্রথম ফুঁকই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফুঁকে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টি-কেই সাধারণভাবে প্রথম ফুঁক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা'র সময় লোকজনের এদিক-ওদিক পলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে وهو الذى يقول الله يوم التناد ফলে জানা গেল যে, আয়াতে يوم التناد বলে প্রথম ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছুটাছুটি বোঝানো হয়েছে। والله اعلم

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ—অর্থাৎ ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন মূসা (আ) ও মু'মিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি,

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে جبار ও متكبر শব্দদ্বয়কে قلب-এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভালমন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। (কুরতুবী)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا—এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে আরোহণ করে আল্লাহ্কে দেখে নিতে চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে এটা 'হবু রাজার গবুমন্ত্রীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন রাজ্যাধিপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাণ্ড করেছিল। কোন সহীহ্ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল, যা উচ্চতায় পৌঁছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব তাঁর ওস্তাদ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম প্রধান শিক্ষক মাওলানা এয়াকুব সাহেব (রা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, এ উচ্চ প্রাসাদ বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য কোন আসমানী আযাব আসা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক নির্মাণের উচ্চতা তার ভিত্তির সহন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তাই যত গভীর ভিত্তিই রাখা হোক না কেন, তা এক সীমা পর্যন্তই গভীর হবে। নির্মাণ কাজের উচ্চতা যদি এই সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তা বিধ্বস্ত হওয়া অপরিহার্য। এতে করে ফেরাউন ও হামানের আরও একটি নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত হয়েছে।

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

এটা স্বগোত্রকে সত্যের দিকে আহবান করার উদ্দেশে মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু

আযাব যখন তোমাদেরক গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মু'মিন ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মুকাতিল বলেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ফেরাউন গোত্রের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আযাব গ্রাস করে নিল। মু'মিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও কষ্ট দেয়ার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মু'মিন বান্দাকে মূসা (আ)-র সাথে রক্ষা করা হয়। এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ——এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কাল পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দু'বার জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল।—(মাযহারী)

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌঁছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌঁছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়।

কবরের আযাব ঃ কবরের আযাব যে সত্য, উপরোক্ত আয়াত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতির হাদীস এবং 'উম্মতের ইজমা' এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا

كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ
الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ
الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ
قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

(৪৭) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতপর দুর্বলরা অহংকারী-দেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত্ত করবে কি? (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন। (৪৯) যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। (৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূল আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্তুত কাফিরদের দোয়া নিষ্ফলই হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও লক্ষণীয়,) যখন কাফিররা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে এবং হীন লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা) উচ্চশ্রেণীর লোকদের (অর্থাৎ অনুসৃত-দেরকে) বলবে, আমরা (দুনিয়াতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা কি এখন আমাদের থেকে জাহান্নামের কোন অংশ নিবৃত্ত করতে পার? (অর্থাৎ দুনিয়াতে যখন তোমরা আমাদেরকে অনুসারী করে রেখেছিলে, তখন আজ আমাদেরকে কিছু সাহায্য করা উচিত নয় কি?) উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বলবে, আমরা সকলেই জাহান্নামে আছি। (অর্থাৎ আমরা আমাদের আযাবই হ্রাস করতে পারি না, তোমাদের আযাব কিরূপে নিবৃত্ত করব?) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে (চূড়ান্ত) ফয়সালা করে দিয়েছেন। (এখন এর বিপরীত করার সাধ্য কার?)

(অতপর ছোট বড়, অনুসারী ও অনুসৃত) যত লোক জাহান্নামে থাকবে, তারা (সবাই মিলে) জাহান্নামের রক্ষী ফেরেশতাগণকে (অনুরোধের সুরে) বলবে, তোমরাই তোমাদের পালনকর্তার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন কোন দিন আমাদের থেকে আযাব

লাঘব করেন! (অর্থাৎ আযাব সম্পূর্ণ রহিত হবে অথবা চিরতরে কম হয়ে যাবে---এরূপ আশা তো নেই, কমপক্ষে একদিনের ছুটি পেলেও তো চলে।) ফেরেশতারা বলবে, (বল তো) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পয়গম্বরগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসেননি (এবং জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার উপায় বলেননি)? জাহান্নামীরা বলবে, হ্যাঁ (এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মানিনি بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا) ---ফেরেশতারা বলবে, তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারি না। কারণ, আমাদেরকে কাফিরদের জন্য দোয়া করার অনুমতি দেয়া হয়নি।) তোমরাই (মনে চাইলে) দোয়া কর। (অবশ্য তোমাদের দোয়াও ফলদায়ক হবে না। কেননা,) কাফিরদের দোয়া (পরকালে) নিষ্ফলই হবে। (কারণ, পরকালে ঈমান ব্যতীত কোন দোয়া কবুল হতে পারে না। ঈমানের স্থান দুনিয়াতেই ছিল, যা তোমরা হারিয়ে ফেলেছ। 'পরকালে' বলার ফায়দা এই যে, দুনিয়াতে কাফিরদের দোয়াও কবুল হতে পারে, যেমন সর্ববৃহৎ কাফির ইবলীসের কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার সর্ববৃহৎ দোয়া কবুল হয়েছে)।

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ
الْاَشْهَادُ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوْٓءُ الدَّارِ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
الْكِتٰبَ ۝ هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝
اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ
صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ ۝ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ اِنَّ

السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

(৫১) আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষী-দের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। (৫২) সেদিন জালিমদের ওযর-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না, তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে মন্দ গৃহ। (৫৩) নিশ্চয় আমি মূসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৫৪) বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতস্বরূপ। (৫৫) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (৫৬) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭) মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৫৮) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকর্মী। তোমরা অল্পই অনুধাবন করে থাক। (৫৯) কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আমার পয়গম্বরগণকে ও মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি [যেমন, উপরে মূসা (আ)-র ঘটনা থেকে জানা গেল।] এবং সেদিনও, (যেদিন (আমলনামা লেখক) সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতাগণ (সাক্ষ্যদানের জন্য) দণ্ডায়মান হবে। (তারা সেদিন সাক্ষ্য দেবে যে, রসূলগণ প্রচারকার্য সমাধা করেছেন এবং কাফিররা মিথ্যারোপ করেছে। এখানে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ) যেদিন জালিমদের (অর্থাৎ কাফিরদের) ওযর-আপত্তি কোন উপকার দেবে না। (অর্থাৎ প্রথমত কোন ওযর-আপত্তি ধর্তব্য হবে না, আর যদি হয়ও, তবে তা উপকারী হবে না।) তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে দুর্ভোগ। (এভাবে আপনি ও আপনার অনুসারীরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং শত্রুরা লাঞ্ছিত ও পরাভূত হবে।

কাজেই আপনি আশ্বস্ত হোন। আপনার পূর্বে) আমি মূসা (আ)-কে হেদায়েতনামা (অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে (সেই) কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, তা ছিল (সুস্থ) বিবেকবানদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ। [বিবেকহীনরা তা দ্বারা উপকৃত হয়নি। এমনিভাবে আপনিও মূসা (আ)-র ন্যায় রিসালত ও ওহীর অধিকারী এবং আপনার অনুসারীরাও বনী ইসরাঈলদের মত আপনার কিতাবের ধারক ও বাহক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিবেকবানরা যেমন অনুসারী ছিল এবং বিবেকহীনরা অস্বীকারকারী ও বিরোধী ছিল, তেমনি আপনার উম্মতের মধ্যেও উভয় প্রকার লোক আছে।] অতএব (এ থেকেও) আপনি (সান্ত্বনা লাভ করুন এবং কাফিরদের উৎপীড়নে) সবর করুন। নিশ্চয় (উপরে لننصر আয়াতে বর্ণিত) আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। (যদি পূর্ণ সবরে ত্রুটি হয়ে যায়, যা শরীয়তের আইনে গোনাহ্ না হলেও আপনার উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ জরুরী হওয়ার ব্যাপারে গোনাহেরই অনুরূপ, তবে তা পূরণ করে নিন। পূরণ এই যে,) আপনি আপনার (সেই) গোনাহের জন্য, (যাকে রূপক অর্থে গোনাহ্ বলে দেওয়া হয়েছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং (এমন কাজে ব্যাপৃত থাকুন, যা দুঃখজনক বিষয়াদি থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখে। সেই কাজ এই যে,) সকাল সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বদা) আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (এ পর্যন্ত সান্ত্বনা সম্পর্কে বলা হল। অতপর বিতর্ককারী কাফিরদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে,) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে (তাদের কাছে বিতর্কের কারণ হতে পারে, এরূপ কোন সন্দেহযুক্ত বিষয় নেই; বরং) তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা কখনও সফল হবে না। (তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে, ফলে অন্যের অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা অন্যদেরকে তাদের অনুসারী করার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু তাদের এই বাসনা পূর্ণ হবে না; বরং সত্বরই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। সে মতে বদর ইত্যাদি যুদ্ধে তারা মুসলমানদের হাতে পরাভূত হয়েছে।) অতএব (তারা যখন বড়ত্বের অভিলাষী, তখন আপনার প্রতি হিংসা ও শত্রুতা সবকিছুই করবে, কিন্তু) আপনি (শঙ্কিত হবেন না বরং তাদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (এসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে তিনি আশ্রিতদেরকে নিরাপদ রাখবেন। এটা ছিল আপনাকে রসূল মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের বিতর্ক। অতপর কিয়ামত সম্পর্কে তাদের বিতর্ক উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পুনরুজ্জীবন অস্বীকারকারীরা খুবই নির্বোধ, কেননা,) নিশ্চয়ই মানুষকে (পুনরায়) সৃষ্টি করা অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে (নতুনভাবে) সৃষ্টি করা কঠিনতর কাজ। (যেমন কঠিন কাজের সামর্থ্য প্রমাণিত, তখন সহজ কাজের তো কথাই নেই। সপ্রমাণের জন্য এ দলীল যথেষ্ট।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এতটুকু বিষয়) বোঝে না। (কেননা, তারা চিন্তাই করে না। কেউ কেউ চিন্তা করে, বোঝে এবং মানেও। এমনিভাবে যারা কোরআন শুনে, তারাও দু'দলে বিভক্ত---একদল বোঝে এবং মানে। তারা চক্ষুষ্মান ও মু'মিন। অপর দল বোঝে না

এবং মানে না। তারা অন্ধের ন্যায় এবং কুকর্মী। এই উভয় প্রকার লোক, অর্থাৎ (এক) চক্ষুষ্মান ও (দুই) অন্ধ এবং (এক) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে ও (দুই) যারা কুকর্মী---তারা পরস্পর সমান নয়। [এতে সব রকম মানুষ আছে বলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে সমান রাখা হবে না বলে কাফিরদের প্রতি কিয়ামতের শাস্তিবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। অতপর যারা অন্ধের ন্যায় ও কুকর্মী, তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে,) তোমরা অল্পই বুঝে থাক। (বুঝলে অন্ধ ও কুকর্মী থাকতে না। কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্কের খবর দিয়ে অতপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে,] কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক (এর প্রমাণাদিতে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে একে) মানে না। (তওহীদ সম্পর্কেও তাদের বিতর্ক ছিল। ফলে আল্লাহ্র সাথে শরীক করত। অতপর এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, (অভাব-অনটন মেটানোর জন্য অপরকে ডেকো না; বরং) আমাকে ডাক। আমি (অসমীচীন প্রার্থনা ব্যতীত) তোমাদের (প্রত্যেক) প্রার্থনা কবূল করব। (দোয়া সম্পর্কে কোরআনের فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ আয়াতের অর্থ তাই যে, অসমীচীন দোয়া কবূল করা হবে না।) যারা (একমাত্র) আমার ইবাদত থেকে (দোয়াসহ) অহংকার ভরে অপরকে ডাকে (ও তার ইবাদত করে অর্থাৎ শিরক করে,) তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে দাখিল হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا—এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূল ও মু'মিনগণকে সাহায্য করেন ইহকালেও এবং পরকালেও। বলা বাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বর যেমন, ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়েব (আ)-কে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা)। তাঁদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে।

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে এর জওয়াব দেন যে, আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ তা পয়গম্বরগণের বর্তমানে তাঁহাদেরই হাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত পয়গম্বর ও মু'মিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পয়গম্বর-হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়েব (আ)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আযাব দেওয়া হয়েছে। ঈসা (আ)-র

শত্রুদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। কিয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ্ তাঁকে শত্রুদের উপর প্রবল করবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রুদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ—যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেখানে পয়গম্বর ও মু'মিনগণের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ—অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য, এ ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাঁদের অন্তরে অহংকার রয়েছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নির্বুদ্ধিতাবশত মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলেও এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে। কোরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তারা তাদের কল্পিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না।—(কুরতুবী)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

দোয়ার স্বরূপ ঃ দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকিরকেও দোয়া বলা হয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করার ওয়াদা করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গম্বরগণকেই বলা হত, দোয়া করুন ; আমি কবুল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—(ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের তফসীরে নো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ان الدعاء هو العبادة অর্থাৎ দোয়াই ইবাদত। অতপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।---(ইবনে কাসীর)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবী ব্যাকরনিক নিয়মে ان الدعاء هو العبادة বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও ইবাদত যদিও পৃথক কিন্তু উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারও সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলা বাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা যা ইবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্মও আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার হামদ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। (অর্থাৎ তার অভাব পূরণ করে দেব।) তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে ঃ

من شغله القران عن ذكرى ومسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়ার মত ফায়দা দেয়।

আরাফাতের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আরাফাতে আমার দোয়াও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলেমা ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ---এতে ইবাদত ও যিকিরকে দোয়া বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দোয়া অর্থে ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে যদি সে অহংকারবশত বর্জন করে। কেননা অহংকারবশত দোয়া বর্জন করা কুফরের লক্ষণ। তাই সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। দোয়া না করলে গোনাহ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলিমের মতে মোস্তাহাব ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ।---(মাযহারী)

দোয়ার ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্র কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই।---(তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, الدعاء مخ العبادة দোয়া ইবাদতের মগজ।---(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যাঞ্চা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্য দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎ ইবাদত।---(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হন।---(তিরমিযী)

তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া না করার কারণে আল্লাহ্র গযবের হুমকি তখন প্রযোজ্য যখন কেউ নিজেকে বড় ও বেপরওয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ আয়াত থেকে তাই প্রামাণিত হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপারক হয়ো না ; কেননা দোয়া-সহ কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।---(ইবনে হাব্বান)

এক হাদীসে আছে, দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর।---(হাকিম)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যার জন্য দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা প্রার্থনা করা অপেক্ষা কোন পছন্দনীয় দোয়া আল্লাহ্র কাছে করা হয়নি।---(তিরমিযী) عافية তথা 'নিরাপত্তা' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হিফাযত ও প্রত্যেক অভাব-অনটন পূরণই অন্তর্ভুক্ত।

কোন গোনাহ্ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া করা হারাম। এরূপ দোয়া কবূলও হয় না।

দোয়া কবূলের ওয়াদা ঃ উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বান্দা আল্লাহ্র কাছে যে দোয়া করে, তা কবূল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোয়া কবূল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মুসলমান আল্লাহ্র কাছে যে দোয়াই করে, আল্লাহ্ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ্ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না হয়। দোয়া কবূল হওয়ার উপায় তিনটি--- তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দোয়া কবূল হয়। এক. যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া। দুই. প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন সওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং

তিন. প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া। ---(মাযহারী)

দোয়া কবূলের শর্ত ঃ উপরোক্ত আয়াতে বাহ্যত কোন শর্ত উল্লেখ নেই। এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবূলের শর্ত নয়। কাফির ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন। ইবলীস কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তা কবূল করেছেন। দোয়ার জন্য কোন সময় এবং ওযূ শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন কোন বিষয়কে দোয়া কবূলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে 'ইয়া রব' ইয়া রব' বলে দোয়া করে; কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কিরূপে কবূল হবে?---(মুসলিম)

এমনিভাবে অসাবধান, বেপরওয়া ও অনামনস্কভাবে দোয়ার বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও কবূল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে---(তিরমিযী)।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۶۱﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۫ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿۶۲﴾ كَذٰلِكَ
یُؤْفَكُ الَّذِیْنَ كَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ﴿۶۳﴾ اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ
الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۴﴾ هُوَ
الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۵﴾
قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ
الْبَیِّنٰتُ مِنْ رَّبِّیْ ۫ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۶﴾ هُوَ الَّذِیْ
خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن
قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ
وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

(৬১) তিনিই আল্লাহ্ যিনি রাত সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬২) তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। (৬৪) আল্লাহ্ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ্ বরকতময়। (৬৫) তিনি চিরজীবী, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাঁকে ডাক—তাঁর খাঁটি ইবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্র। (৬৬) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার অনুগত থাকতে। (৬৭) তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিতকালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। (৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন একথাই বলেন, 'হয়ে যা'—তা হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ যিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম কর, তিনিই দিবসকে (দেখার জন্য) উজ্জ্বল করেছেন (যাতে তোমরা অবাধে জীবিকা অর্জন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি খুব অনুগ্রহশীল (তিনি তাদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন); কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এসব নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না (বরং উল্টা শিরক) করে। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, (তারা নয়, যাদেরকে তোমরা মনগড়া তৈরি করে রেখেছ।)

তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। (তওহীদ প্রমাণিত হওয়ার পর) তোমরা কোথায় (শিরক করে) উল্টা দিকে যাচ্ছ? (তোমাদেরই কথা কি, তোমরা যেমন বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশত উল্টা দিকে যাচ্ছে,) এমনিভাবে (পূর্ববর্তী) তারাও উল্টা চলত, যারা আল্লাহ্‌র (সৃষ্টিগত ও আইনগত) নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। আল্লাহ্‌ই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বাসস্থান করেছেন এবং আকাশকে (উপরে) ছাদ (সদৃশ) করেছেন। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করে চমৎকার আকৃতি করেছেন। (সেমতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমান কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসমঞ্জস নয়। এটা প্রত্যক্ষ ও স্বীকৃত।) তিনি তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট বস্তু আহারের জন্য দিয়েছেন। (সুতরাং) তিনি আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা, অতপর উচ্চ মর্যাদাবান আল্লাহ্, যিনি সারাবিশ্বের পালনকর্তা। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা (সকলেই) খাঁটি বিশ্বাস সহকারে তাঁকে ডাক (এবং শিরক করো না)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্ব পালনকর্তা। আপনি (মুশরিকদের উদ্দেশে) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক) স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে শিরক করতে নিষেধ করা হয়েছে।) আমাকে আদেশ করা হয়েছে (একমাত্র) বিশ্ব পালনকর্তার সামনে (ইবাদতে) মাথা নত রাখতে। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি তওহীদ মেনে নিতে আদিষ্ট হয়েছি।) তিনিই তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের আদি পুরুষদেরকে) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতপর (তার বংশধরকে) বীর্য দ্বারা, অতপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে শিশুরূপে (মায়ের গর্ভ থেকে) বের করেন, অতপর (তোমাদেরকে জীবিত রাখেন,) যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতপর (তোমাদেরকে আরও জীবিত রাখেন) যাতে তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কেউ কেউ (যৌবনে ও বার্ধক্যে পৌঁছার) পূর্বেই মারা যায় এবং (তোমাদের প্রত্যেককেই এক বিশেষ বয়স দেন,) যাতে তোমরা সবাই (নিজ নিজ) নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং (এসব কাজ এজন্য করেছেন,) যাতে তোমরা (এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্‌র তওহীদকে) অনুধাবন কর। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি যখন কোন কাজ (অকস্মাৎ) পূর্ণ করতে চান, তখন এতটুকু বলে দেন, 'হয়ে যা', তা হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কতিপয় নিদর্শন পেশ করে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ——চিন্তা করুন, নিদ্রা

কত বড় নিয়ামত! আল্লাহ্ তা'আলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সে সময়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিদ্রার উপযোগী করে দিয়েছেন। এখন রাত্রিবেলায় নিদ্রা আসা সকলেরই স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের জন্য যেমন নিজ নিজ স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করে, নিদ্রাও যদি তেমনি ইচ্ছাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার পরিকল্পনা করত, তবে নিদ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরও কাজ কারবারের শৃংখলা বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে। বিভিন্ন সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের সেই কাজ, যা নিদ্রিতদের সাথে জড়িত, বিঘ্নিত হয়ে যেত এবং নিদ্রিতদের সেই কাজও পণ্ড হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি কেবল মানুষের নিদ্রার সময় নির্দিষ্ট থাকত এবং জন্তু--জানোয়ারের নিদ্রার সময় ভিন্ন হত তবুও মানুষের কাজের শৃংখলা বিঘ্নিত হত।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ——মানুষের আকৃতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সকল থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও শিল্পসামগ্রী তৈরি করে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র। জন্তু-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতের সাহায্যে করে। সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ফল-মূল, তরি-তরকারি, গোশত ও মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্বাদযুক্ত করে খায়। এক এক ফল দ্বারা রকমারি খাদ্য——আচার, মুরব্বা ও চাটনী তৈরী করে খায়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾
إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي
النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ
دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ
يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ
فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم
مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

(৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় ফিরছে? (৭০) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতএব সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে (৭৩) অতপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (৭৪) আল্লাহ্ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনিভাবে আল্লাহ্ কাফির-দেরকে বিভ্রান্ত করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল! (৭৭) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতপর আমি কাফিরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে। (৭৮) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা (সত্য থেকে) কোথায় ফিরছে? যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। (এতে

কিতাব, বিধানাবলী ও মু'জিযা সব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, আরবের মুশরিকরা অন্য কোন পয়গম্বরকেও মানতো না।) অতএব সত্বরই (অর্থাৎ কিয়ামতে) তারা জানতে পারবে, যখন বেড়ি তাদের গলদেশে থাকবে এবং (বেড়ি) শৃংখল (যুক্ত হবে, শৃংখলের অপর প্রান্ত ফেরেশতাদের হাতে থাকবে। এসব শৃংখল দ্বারা) তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। অতপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথায় গেল আল্লাহ্ ব্যতীত সেই উপাস্য-গুলো, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে? (অর্থাৎ তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?) তারা বলবে, তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বরং (সত্য কথা এই যে,) আমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে যে প্রতিমা পূজা করতাম, এখন জানা গেল যে,) আমরা কোন কিছুর পূজা করতাম না। (অর্থাৎ বোঝা গেল যে, তারা কোন বস্তুসত্তা ছিল না। ভুল ফুটে উঠলে এ ধরনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ যখন কোন কাজের ফলই অর্জিত হয় না, তখন মনে করা উচিত যে, সবই কাজই হয়নি) আল্লাহ্ এমনিভাবে কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (যে বিষয়ের কোন বস্তুসত্তা না হওয়া এবং অনুপকারী হওয়ার কথা তারা নিজেরাই পরকালে স্বীকার করবে, আজ ইহকালে তারা তারই পূজায় মশগুল রয়েছে। বলা হবে,) এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (এর আগে তাদেরকে আদেশ করা হবে,) প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে (এবং) চিরকাল এখানে থাক। কত নিকৃষ্ট দাম্ভিকদের আবাসস্থল! (তাদের কাছ থেকে যখন এভাবে প্রতিশোধ নেয়া হবে, তখন) আপনি সবর করুন (কিছুদিন)। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতপর আমি কাফির-দেরকে যে শাস্তির (সর্বাবস্থায়) ওয়াদা দেই (যে, কুফর করলে আযাব হবে) তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় তাদের উপর কিছু আযাব নাযিল হয়,) অথবা (নাযিল হওয়ার পূর্বেই) আমি আপনার প্রাণ হরণ করি (পরবর্তীতে আযাব নাযিল হোক বা না হোক)---সর্বাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে। (তখন নিশ্চিতরূপেই তাদের উপর আযাব নাযিল হবে। একথা স্মরণ করেও সান্ত্বনা লাভ করুন যে,) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাঁদের কারও কারও কাহিনী আপনার কাছে (সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিত) বিবৃত করেছি এবং কারও কারও কাহিনী বিবৃত করিনি। (এতটুকু বিষয় সকলের মধ্যেই অভিন্ন যে,) কোন রসূল দ্বারা এটা হতে পারেনি যে, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন মু'জিযা নিয়ে আসবে (এবং উম্মতের প্রত্যেক আবদার পূর্ণ করবে। কেউ কেউ এ কারণেও তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। এমনিভাবে মুশরিকরা আপনার প্রতিও মিথ্যারোপ করে। কাজেই আপনি সান্ত্বনা রাখুন এবং সবর করুন।) অতপর যখন (আযাব নাযিল হওয়া সম্পর্কিত) আল্লাহ্র আদেশ আসবে, (ইহকালে হোক কিংবা পরকালে) তখন ন্যায়সঙ্গত (কার্যগত) ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যা-পন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ—এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حميم অর্থাৎ ফুটন্ত পানিতে ও পরে جحيم অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, حميم জাহান্নামের বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্য জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা সাফফাতের আয়াত ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ—থেকেও তাই জানা যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, حميم ও جحيم একই স্থান এবং حميم এর মধ্যেই جحيم অবস্থিত। আয়াতটি এই—

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। জাহান্নামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। ইবনে-কাসীর বলেন, জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কখনও টেনে হামীমে এবং কখনও জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে।

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا—অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা বলবে—আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

فرح—بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ

এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং مرح এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। مرح সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে فرح অর্থাৎ আনন্দ যদি ধনসম্পদের নেশায় আল্লাহ্‌কে ভুলে গোনাহ্‌র কাজ

দ্বারা হয়, তবে হারাম ও নাজায়েয। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারূনের কাহিনীতেও فرح এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ—অর্থাৎ আনন্দ-উল্লাস করো না। আল্লাহ্ তা'আলা আনন্দ-উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ-উল্লাসের আরেক স্তর হল পার্থিব নিয়ামত ও সুখকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয, মুস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কোরআন বলে, فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا—অর্থাৎ এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য আয়াতে مرح-কে সর্বাবস্থায় আযাবের কারণ বলা হয়েছে এবং فرح-এর সাথে بغير الحق কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া ইবাদত ও সওয়াবের কাজ।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ—এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সানন্দে কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সান্ত্বনার জন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের আযাবের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে—আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করা বাহ্যত 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (বিশ্বজগতের জন্য রহমত) গুণের পরিপন্থী। কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরাপরাধ মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে সাজা দেওয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থী নয়। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কারও মতেই দয়ার পরিপন্থীরূপে গণ্য হয় না।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝
وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۗ فَاَیَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ
تُنْكِرُوْنَ ۝ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِی الْاَرْضِ

فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا
بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ۝ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا
سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

(৭৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। (৮০) তাতে তোমাদের জন্য অনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। (৮৩) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানগরিমার দম্ভ প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। (৮৪) তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম। (৮৫) অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ্র এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর কোন কোনটিতে আরোহণ কর এবং কোন কোনটি আহারও কর। এগুলোতে তোমাদের আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে (যেমন এদের লোম ও পশম কাজে লাগে,) আর এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলোতে সওয়ার হয়ে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার (যেমন, কারও সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া, ব্যবসায়ের জন্য যাওয়া ইত্যাদি। সওয়ার হওয়ার জন্য এগুলোরই বিশেষত্ব কি, বরং) এগুলোর উপর এবং

নৌকার উপরও তোমরা বাহিত হও। তিনি তোমাদেরকে (এগুলো ছাড়া আরও কুদ-রতের) নিদর্শনাবলী দেখান। (সেমতে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুই তাঁর সৃষ্টির এক নিদর্শন।) অতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (তারা যে প্রমাণাদি সত্ত্বেও তওহীদ অস্বীকার করে, তারা কি শিরকের শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞাত নয়?) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তী (মুশরিক)-দের কি পরিণাম হয়েছে, অথচ তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায়ও বেশি ছিল এবং শক্তিতে ও কীর্তিতেও (যেমন, দালানকোঠা ইত্যাদি) অধিক প্রবল ছিল। অতপর তাদের কোন কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি (এবং তারা আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের (জীবিকা উপার্জন সম্পর্কিত) জ্ঞান-গরিমার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল। (অর্থাৎ জীবিকাকে লক্ষ্য মনে করে তৎসম্পর্কিত জ্ঞান-গরিমা নিয়েই মগ্ন ছিল এবং পরকাল অস্বীকার করেছিল। যারা পরকাল অন্বেষণ করত, তাদেরকে তারা উন্মাদ বলত এবং শাস্তির কথা শুনলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত) তারা যে (শাস্তির) বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই (অর্থাৎ সে শাস্তিই) তাদেরকে গ্রাস করে নিল। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, (এখন) আমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদের সবাইকে অস্বীকার করলাম। অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না, যখন তারা আমার আযাব প্রত্যক্ষ করল। (কারণ, এটা ছিল নিরুপায় অবস্থার ঈমান। বান্দা ইচ্ছাধীন ঈমানে আদিষ্ট।) আল্লাহ্র এ নিয়মই বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে (অর্থাৎ সেখানে ঈমান উপকারী হয় না,) কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সুতরাং মক্কার মুশরিকদেরও এটা বুঝে ভীত হওয়া উচিত! তাদের বেলায়ও তাই হবে। তখন ক্ষতিপূরণের কোন পথ থাকবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ — অর্থাৎ এই অপরিণামদর্শী কাফিরদের কাছে যখন আল্লাহ্র পয়গম্বরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে, পয়গম্বরগণের জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য মনে করে পয়গম্বরগণের উক্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হল। কাফিররা যে জ্ঞান নিয়ে গর্বিত ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্খতা ছিল, অর্থাৎ তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে একেই জ্ঞান-গরিমারূপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শী ছিল। গ্রীক দার্শনিকদের 'ইলাহিয়্যাত' সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা প্রথমোক্ত নিরেট মূর্খ শ্রেণীর জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টান্ত। তাদের এসব জ্ঞানের কোন দলীল নেই। এগুলোকে জ্ঞান বলা জ্ঞানের অবমাননা বৈ নয়। কাফিরদের পার্থিব জ্ঞানের উল্লেখ

কোরআন পাক সূরা রূমে এভাবে করেছে ঃ—يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ ----অর্থাৎ তারা পাথিব জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে-বোঝে ; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী। আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিকজ্ঞান অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের সুখ ও কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গম্বরগণের জ্ঞানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।-----(মাযহারী)

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ ----অর্থাৎ আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান আনছে। এসময়কার ঈমান আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে ঃ --অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা কবূল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর তওবা করলে কবূল হয় না। এমনিভাবে আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর কারও তওবা ও ঈমান কবূল হয় না।

اللهم انا نسئلك العفو والعافية والتوبة قبل الموت واليسر والمعافاة عند الموت والمغفرة والرحمة بعد الموت ببركة ال حم وصلى الله تعالى على النبى الكريم -

سورة حم السجدة

সূরা হা—মীম সিজদাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٣ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝٤ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ
وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا
عٰمِلُوْنَ ۝٥ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝٦
الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٧ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে শুরু—

(১) হা—মীম, (২) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। (৩) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, অতএব

তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা—মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।) এই কালাম পরম করুণাময় দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরিষ্কার বিবৃত অর্থাৎ এমন কোরআন, যা আরবী (ভাষায়) লিপিবদ্ধ (যাতে প্রত্যক্ষভাবে আরবের লোকেরা সহজে বোঝে নেয়), এমন লোকদের জন্য (উপকারী) যারা বিজ্ঞ। (অর্থাৎ যদিও সবাই এর সম্বোধনের পাত্র, কিন্তু উপকৃত তারাই হয়, যারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী। কোরআন এমন লোকদের জন্য) সুসংবাদদাতা এবং (অমান্যকারীদের জন্য) সতর্ককারী। অতপর (সকলেরই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল; কিন্তু) অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনেই না। (যখন আপনি তাদেরকে শোনান, তখন) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত (অর্থাৎ আপনার কথা আমাদের বুঝে আসে না), আমাদের কানে ছিপি আঁটা রয়েছে এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (অর্থাৎ আমরা কবুল করব—এরূপ আশা করবেন না। আমরা আমাদের কর্মপন্থা ত্যাগ করব না।) আপনি বলে দিন, (তোমাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করার শক্তি আমার নেই, কেননা,) আমিও তোমাদেরই মত মানুষ, (আল্লাহ্ নই যে, তোমাদের অন্তর পাল্টে দেব। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন যে,) আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ। (চিন্তা করলে প্রত্যেকেই এ ওহীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা বুঝতে পারে। মু'জিযার মাধ্যমে আমার নবুয়ত ও ওহী প্রমাণিত হওয়ার পর তা মেনে নেওয়া প্রত্যেকের উপর ফরয। তোমাদের না মানার কোন কারণ নেই। অবশ্যই মেনে নাও।) অতএব তাঁর (সত্য মাবুদের) দিকেই সোজা হয়ে থাক (অর্থাৎ অন্য কারও ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিও না) এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (অর্থাৎ অতীত শিরক থেকে তওবা কর এবং ভুলের জন্য ক্ষমা চাও) আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা (নবুয়তের প্রমাণাদি দেখা এবং তওহীদের প্রমাণাদি শোনা সত্ত্বেও নিজেদের মিথ্যা ধর্মমত পরিত্যাগ করে না) এবং যাকাত প্রদান করে না এবং তারা পরকালকে অস্বীকার করে। (তাদের বিপরীতে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য (পরকালে) অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের জন্যে 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণত সূরা মু'মিনের হামীমকে 'হা-মীম আল মু'মিন' এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা---মীম আস্-সিজদাহ' অথবা হা-মীম ফুসসিলাত'ও বলা হয়। এ সূরার এ দু'টি নাম সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কোরাইশ গোত্র, তাদের সামনে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা কোরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অসংখ্য মু'জিযা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জওয়াবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবূল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে কোরাইশকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন আরবী ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কোরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ --- تفصيل এর আসল অর্থ বিষয়বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা---পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কোরআন পাকের আয়াত-সমূহে বিধানাবলী, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থীদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআন পাকের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কোরাইশরা এসব সত্ত্বেও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে---হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ ---আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে কাফিরদের একটি প্রস্তাবঃ আলোচ্য সূরায় কোরাইশ কাফিরদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে উমর ইবনে খাত্তাবের ন্যায় অসমসাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতপর সর্বজন স্বীকৃত কোরাইশ সরদার হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কোরাইশ কাফিররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেয ইবনে কাসীর মসনদে বাযযার, আবূ ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আসসীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এ স্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব—যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রা) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাক নাম) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করলঃ প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা ফুসসিলাত তিলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত করতে করতে যখন فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ —পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদার আয়াতে পৌঁছে সিজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন ঃ আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহ্র কসম, আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌঁছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই ঃ

انى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة يا معشر قريش اطيعونى واجعلوها لى خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت

بنا ء فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم و ان يظهر على العرب فملكه ملككم و عزه عزكم وكنتم اسعد الناس به -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আল্লাহ্‌র কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মুকাবিলা ও তাঁকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেননা, তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইয্‌যত হবে তোমাদেরই ইয্‌যত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ —এ ক্ষেত্রে কাফিরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক. আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি না। দুই. আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিন. আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কোরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কোরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আন'আমের আয়াতে আছে ঃ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا — এমনি ধরনের আয়াত সূরা বনী-ইসরাইল ও সূরা কাহ্‌ফেও রয়েছে।

এর জওয়াব এই যে, কাফিরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যে অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কোরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সারমর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বোঝাবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে

দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে।----(বয়ানুল কোরআন)

কাফিরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব ঃ কাফিররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তাবকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রূপের এ জওয়াব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মুকাবিলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ্ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহ্র অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের জন্য তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মু'মিনদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ ----অর্থাৎ তারা যাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফিরদেরকে যাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে যাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাযের সাথে ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নিসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় যাকাত ফরয ছিল না।

কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কি না ঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফিকাহবিদের মতে কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়; অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বিধান বলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করুক। ঈমানের পরে ফরয কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব তাদের উপর যখন যাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র হবে কেন?

জওয়াব এই যে, অনেক ফিকাহবিদের মতে কাফিররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফিরদেরকে

আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে যাকাত না দেয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি; বরং তাদের যাকাত না দেওয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং যাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মু'মিন হলে যাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মু'মিন না হওয়া। —(বয়ানুল কোরআন)

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জওয়াবে বলেন যে, কোরাইশ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কোরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ—ممنون শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওযরবশত তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী থেকে, শর হুস্‌সুন্নায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রা) থেকে এবং রাযীনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ
لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن
فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ
سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ
لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ

أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

(৯) বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। (১০) তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন--পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্য। (১১) অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ, অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। (১২) অতপর তিনি আকাশ মণ্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা কি সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর, যিনি পৃথিবীকে (সুদূর বিস্তৃতি সত্ত্বেও) দু'দিনে (অর্থাৎ দু'দিনের সমপরিমাণ সময়ে) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনিই তো (আল্লাহ্ যার কুদরত জানা গেল,) সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বত-মালা সৃষ্টি করেছেন, তাতে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) কল্যাণ নিহিত রেখেছেন (যেমন উদ্ভিদ, জীবজন্তু ইত্যাদি) এবং তাতে (বসবাসকারীদের) খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (যেমন দেখা যায়, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপযুক্ত আলাদা আলাদা খাদ্য রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বপ্রকার খাদ্য ও ফলমূল সৃষ্টি করেছেন---কোথাও এক প্রকার; কোথাও অন্য প্রকার। এর ধারা সর্বদা অব্যাহত রয়েছে। এসব কাজ) চার দিনে (হয়েছে। দু'দিনে পৃথিবী এবং দু'দিনে পর্বত ইত্যাদি। এটা গণনায়) পূর্ণ হয়েছে জিজ্ঞাসুদের জন্য। (অর্থাৎ তাদের জন্য, সারা জগৎ সৃষ্টির অবস্থা ও দিনের পরিমাণ সম্পর্কে আপনাকে যারা জিজ্ঞাসা করে। ইহুদীরা এ জিজ্ঞাসা করেছিল।) অতপর তিনি (এগুলো সৃষ্টি করে) আকাশের দিকে (অর্থাৎ আকাশ নির্মাণের দিকে) মনোনিবেশ করলেন, যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ (অর্থাৎ আকাশের উপকরণ ধূম্রের আকারে বিদ্যমান ছিল।) অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ উভয়কে আমার অনুগত্যে অবশ্যই আসতে হবে, এখন তোমাদের ইচ্ছা,) খুশীতে আস অথবা অখুশীতে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার অবধারিত বিধিবিধান তোমাদের মধ্যে প্রয়োগ হবে। তোমরা চাও বা না চাও, তা হবেই হবে। কিন্তু

তোমাদেরকে প্রদত্ত চেতনা ও অনুভূতির দিক দিয়ে তোমরা আমার বিধানাবলীকে আনন্দেও গ্রহণ করতে পার—সর্বাবস্থায় তা প্রয়োগ হবে। উদাহরণত মানুষের জন্য রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যু একটি অবধারিত ব্যাপার। মানুষ একে এড়াতে পারে না। কিন্তু কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একে হাসিখুশী কবুল করে সবর ও শোকরের উপকারিতা অর্জন করে এবং কেউ কেউ নারাজ ও অসন্তুষ্ট থাকে—তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে। এখন তোমরা দেখ আমার বিধানাবলীতে সন্তুষ্ট থাকবে, না অসন্তুষ্ট? অবধারিত বিধানাবলী বলে আকাশ ও পৃথিবীর সেসব পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হওয়ার ছিল। যেমন, ধূম্রকুঞ্জের আকারে বিদ্যমান আকাশের সপ্ত আকাশে পরিণত হওয়া একটি অবধারিত বিধান ছিল।) তারা বলল, আমরা সানন্দে (এ বিধানাবলীর জন্য) হাযির রয়েছি। অতপর তিনি আকাশকে দু'দিনে সপ্ত আকাশে পরিণত করলেন। (সপ্ত আকাশকেই ফেরেশতাদের দ্বারা আবাদ ও পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই) প্রত্যেক আকাশে তার উপযুক্ত আদেশ (ফেরেশতাদের কাছে) প্রেরণ করলেন। (অর্থাৎ ফেরেশতাকে তার কাজ বলে দিলেন।) আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং (শয়তানকে আকাশের সংবাদ চুরি করা থেকে নিরস্ত করার জন্য) তাকে সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, এমন মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুঁশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাকারার তৃতীয় রুকূতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

সূরা বাকারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোন্‌টির পর কোন্‌টি এবং কোন্ কোন্ দিনে সৃজিত হয়েছে ঃ বয়ানুল কোনআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কোরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টির পরে কোন্‌টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবত মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে---এক. হা-মীম সিজদার আলোচ্য আয়াত, দুই. সূরা বাকারার উল্লিখিত আয়াত এবং তিন. সূরা নাযি'আতের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

ءَ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا -

বাহ্য দৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সূরা বাকারা ও সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূম্র-কুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।---(বয়ানুল কোরআন---সূরা বাকারা)

সহীহ্ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা থানভী (র) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিম্নরূপ ঃ

فسواهن فى يومين اخرين ثم دحى الارض ودحيها ان اخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال الجماد والاكام ما بينهما فى يومين اخرين - فذلك قول الله تعالى دحاها -

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে রোববার ও সোমবার, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চারদিন সময় লাগে। আলোচ্য سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সম্ভাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশে সিজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে।---(ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীরের মতে হাদীসটি غريب (অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।)

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কোরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টি কাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ----অর্থাৎ আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

ইবনে আব্বাসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে আদম (আ)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সিজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

অথচ কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল — إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ---(মাযহারী)

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনা-সমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কাসীর মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আয়াতকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্র করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়ত জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চারদিন লেগেছে। তৃতীয়ত জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলী সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দু'দিনের বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযিয়াতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল কোরআনের বক্তব্য অবান্তর নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদনদী, ঝরনা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াতে প্রথমে خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অতপর আলাদা করে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ এতে তফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত।

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ বলার পর যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপনা আপনিই জানা যেত, কিন্তু কোরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হল মোট চার দিন। এতে বাহ্যত ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চারদিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের خَلَقَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا—বাক্যের আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا—ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কোরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরী ছিল না; বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূপৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীবজন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে مِنْ فَوْقِهَا বলে এই নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّآئِلِيْنَ শব্দটি اقوات—قوت-এর বহুবচন। অর্থ রিযিক, রুজি, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। —(যাদুল মাসীর)

হযরত হাসান ও সুদ্দী এ আয়াতের তফসীরে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিযিক ও রুজি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূখণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজাজ ও রুচি মোতাবিক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূখণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্নরূপে হয়েছে। কোন ভূখণ্ডে গম, কোন ভূখণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহ্হাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব

দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোন ভূখণ্ডই অন্য ভূখণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূখণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহাগুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীবজন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূগর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতপর سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ বাক্যটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে اربعة ايام-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চারদিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় চার থেকে কিছু বেশিও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেওয়া হয়। আয়াতে سَوَاءً শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, এ কাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। لِّلسَّائِلِينَ—এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য এই গণনা। ইবনে জরীর ও দুররে মনসুরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চারদিনে হয়েছে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

ইবনে যায়েদ প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِلسَّائِلِينَ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা سائلين-এর অর্থ নিয়েছেন প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তাদের উপকারার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে سائلين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।—(বাহরে মুহীত)

ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কোরআনে এ আয়াতের অনুরূপ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ—অর্থাৎ তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ—কোন

কোন তফসীরবিদের মতে আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেওয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোন রূপক অর্থ নাই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বোঝার চেতনা ও অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়াব দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তফসীরে বাহ্‌রে মুহীতে এ তফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে কারও কারও এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূখণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ্ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহ্‌র বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে 'বায়তুল মামুর' বলা হয়।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ
وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي
خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ
الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزٰى وَهُمْ

لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى
فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ
نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ
اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾ حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوْا
لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ
شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ
وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ
الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ
يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ
الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

(১৩) অতপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামূদের আযাবের মত (১৪) যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা বলতে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম। (১৫) যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা

অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। (১৬) অতপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্য তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (১৭) আর যারা সামুদ, আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছিলাম, অতপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ এসে ধৃত করল। (১৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যে দিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে একত্র করা হবে। (২০) তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। (২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না (২৩) তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। (২৪) অতপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওযরখাহী করে, তবে তাদের ওযর কবুল করা হবে না। (২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতপর (তওহীদের প্রমাণাদি শুনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে এমন এক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করি, যেমন আদ ও সমূদের উপর (শিরক ও কুফরের কারণে) বিপদ এসেছিল। ('বিপদ' বলে ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। যেমন, কোরায়েশ সরদাররা বদর যুদ্ধে ধ্বংস ও বন্দী হয়েছিল। আদ ও সামূদের এ বিপদ তখন ঘটেছিল,) যখন তাদের কাছে তাদের সম্মুখ দিক থেকে ও পশ্চাদ্দিক থেকেও রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (অর্থাৎ পয়গম্বরগণ তাদেরকে বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। যেমন, কেউ তার প্রিয়জনকে বিপদ ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কখনও সম্মুখ দিক দেখে এসে

তাকে বাধা দেয় এবং কখনও পশ্চাদ্দিক থেকে এসে তাকে ধরে। কোরআনে ইবলীসের এ উক্তির দৃষ্টান্ত ঃ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ—অর্থাৎ আমি আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিক থেকেও আসব এবং পশ্চাদ্দিক থেকেও। পয়গম্বরগণ তাদেরকে এ কথাই বলেছেন।) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। তারা বলেছিল, (তোমরা যে তওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার দাবি কর, এটাই ভ্রান্ত।) কেননা, যদি আমাদের পালনকর্তা (এটা) ইচ্ছা করতেন, (যে, কাউকে পয়গম্বর করে পাঠাবেন,) তবে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করতেন। অতএব আমরা তোমাদের আনীত (তওহীদের) বিষয়ও অমান্য করলাম যা দিয়ে (তোমার দাবি অনুসারে) তোমাকে (পয়গম্বর বানিয়ে) পাঠানো হয়েছে। অতপর (এ অভিন্ন উক্তির পর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ অবস্থা এই যে,) যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে লাগল এবং (যখন শাস্তিবাণী শুনল, তখন) বলতে লাগল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে (যে আমাদেরকে আযাবে ফেলবে আর আমরা তা প্রতিহত করতে পারব না)? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিধর? (কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করল না।) বস্তুত তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে থাকে। অতপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্য তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু এমন দিনগুলোতে প্রেরণ করলাম, যা (আযাব অবতরণের কারণে তাদের জন্য) অশুভ ছিল। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর। তখন (কারও পক্ষ থেকে) তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। আর যারা ছিল সামূদ, (তাদের অবস্থা এই যে,) আমি তাদেরকে (পয়গম্বরগণের মাধ্যমে) পথ প্রদর্শন করেছিলাম, তারা হেদায়েতের মোকাবিলায় পথভ্রষ্টতাকেই পছন্দ করল। অতপর তাদের কুকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ পাকড়াও করল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে (এ আযাব থেকে) রক্ষা করলাম। (এখন পরকালের আযাব বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ তাদেরকে সে দিনটিও স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে অর্থাৎ কাফিরদেরকে) জাহান্নামের দিকে একত্র করার জন্য (হিসাবের জায়গায়) আনা হবে। অতপর (রাস্তায় বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এবং একত্র রাখার জন্য) তাদেরকে থামানো হবে [যাতে পেছনের লোকও আগের লোকের সঙ্গী হয়ে যায়। সুলায়মান (আ)-এর ঘটনায় সমস্ত সৈন্যকে একত্র করার জন্য فَهُمْ يُوزَعُونَ বলা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে থামানো হবে।] যখন তারা (সবাই একত্রিত হয়ে) জাহান্নামের দিকে পৌঁছবে (অর্থাৎ হিসাবের জায়গায়—সেখান থেকে জাহান্নাম নিকটেই দৃষ্টিগোচর হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, জাহান্নামকে হিসাবের জায়গায় উপস্থিত করা

হবে এবং কাফিররা চতুর্দিকে আগুনই আগুন দেখবে। মোটকথা হিসাবের জায়গায় আসার পর যখন হিসাব শুরু হবে,) তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা (অবাক হয়ে) তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? আমরা তো দুনিয়াতে সবকিছু তোমাদের সুখের জন্যই করতাম। (হাদীসে আনাসের রেওয়ায়েতে তাদের এ উক্তি বর্ণিত আছে।) তারা (অংগসমূহ) বলবে, যে (সর্বশক্তিমান) আল্লাহ্ যিনি সবকিছুকেই বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনিই আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন (ফলে আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁর কুদরত প্রত্যক্ষ করছি।) তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁরই কাছে (আবার জীবিত হয়ে) তোমরা প্রত্যাবর্তিত হয়েছ। (সুতরং এমন সর্বশক্তিমানের জিজ্ঞাসার জওয়াবে আমরা সত্যকথা কিরূপে গোপন করতে পারি? তাই সাক্ষ্য দিয়েছি। অতপর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে বলবেন,) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তোমরা যা কিছু কর, তার অনেক কিছু আল্লাহ্ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। কেননা, এ বিশ্বাসের ফলে কুফরের কাজ-কর্ম করেছ এবং সে কাজকর্মই ধ্বংসের কারণ হয়েছে, ফলে তোমরা (চিরতরে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। অতপর (এমতাবস্থায়) যদি তারা সবর করে (এবং ওযরখাহী না করে,) তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। (তাদের সবর দয়ার কারণে হবে না, যেমন দুনিয়াতে প্রায়ই হত।) আর যদি তারা ওযরখাহী করে, তবে তাদের ওযর কবূল হবে না। আমি (দুনিয়াতে) তাদের পেছনে কিছু সঙ্গী (শয়তান) লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে রেখেছিল। (তাই তারা কুফরকে আঁকড়িয়ে রেখেছিল। কুফরকে আঁকড়িয়ে থাকার কারণে) তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষ (কাফির)-দের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারাও ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا —এটা صاعقة এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও সামুদের صاعقة বলে বর্ণিত হয়েছে। صاعقة শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুঁশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صاعقة বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صاعقة ছিল। একেই ريح صرصر নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ ঝন্ঝাবায়ু, যাতে বিকট আওয়ায থাকে।—(কুরতুবী)

যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষদিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুত যে কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে।---(কুরতুবী, মাযহারী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কোন জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

فِيْ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ — ইসলামের নীতি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অশুভ হওয়া জরুরী হয় না।---(মাযহারী, বয়ানুল কোরআন)

فَهُمْ يُوزَعُونَ — এটা وزع থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা। তফসীরের সার সংক্ষেপে এ অনুবাদই করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেওয়া হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।---(কুরতুবী)

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ الخ — আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ গোপনে কোন গোনাহ্ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত-পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোন অপরাধ ও গোনাহ্ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তওহীদ ও রিসালত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে

আল্লাহ্‌র সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন তাঁর জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না ? কিন্তু তোমরা এই জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজকর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলা বাহুল্য, তোমাদের এই বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান ঃ সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ্ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ ভাল কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, بعدا لكن و سحقا فعنكن أناضل অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে।---(মাযহারী)

হযরত ম'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যা কিছু আমার মধ্যে করবে, কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোন পুণ্যকাজ করে নেওয়া, যাতে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কখনও পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রি মানুষকে ডেকে একথা বলে।--(কুরতুবী)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا
وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ
النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا
يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

(২৬) আর কাফিররা বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। (২৭) আমি অবশ্যই কাফির-দেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) এটা আল্লাহ্‌র শত্রুদের শাস্তি---জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফল-স্বরূপ। (২৯) কাফিররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে সব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা (পরস্পর) বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণই করো না এবং (যদি পয়গম্বর শুনাতে আরম্ভ করে তবে) তাতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে (এভাবে) তোমরাই জয়ী হও। (পয়গম্বর হার মেনে চুপ হয়ে যায়। এই নাপাক ইচ্ছা ও দুরভি-সন্ধির কারণে) আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং তাদেরকে তাদের মন্দ কর্মের শাস্তি দেব। শাস্তি আল্লাহ্‌র শত্রুদের এই অর্থাৎ জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্য থাকবে স্থায়ী আবাস আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতি-ফলস্বরূপ। (আযাবে পতিত হয়ে) কাফিররা বলবে হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে সে দু'শয়তান ও মানবকে দেখিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।

(অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তখন তাদের প্রতি কাফিরদের ক্রোধ হবে। এই পথভ্রষ্টকারীরা হবে মানুষ ও শয়তান---এক একজন

করে হোক কিংবা বেশী করে। পথভ্রষ্টকারীরাও জাহান্নামেই থাকবে, কিন্তু এসব কথাবার্তার সময় তারা সামনে থাকবে না। তাই সামনে আনার আবেদন জানাবে। তাদের এ আবেদন মঞ্জুর হবে কি না, তা কোন আয়াত অথবা রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ — কাফিররা কোরআনের মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবূ জহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কোরআন তিলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফিররা শিস দিয়ে, তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। —(কুরতুবী)

নীরবতার সাথে কোরআন শ্রবণ করা ওয়াজিবঃ হৈ-হুল্লোড় করা কাফিরদের অভ্যাসঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তিলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরও জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কোরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্মচারীরা তাদের কাজকর্মে এবং গ্রাহকরা খানা-পিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যত এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা কাফিরদের আলামত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কোরআন তিলাওয়াতের জন্য রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا
مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ

صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا
السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ
عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۝ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ
وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(৩০) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৩১) ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর (৩২) এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (৩৩) যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? (৩৪) সমান নয় ভাল ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৩৫) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (৩৬) যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহ্র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (আন্তরিকভাবে) বলে, আমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা (একমাত্র) আল্লাহ্, (অর্থাৎ শিরক ত্যাগ করে তওহীদ অবলম্বন করে---) অতপর (তাতে) অবিচলিত থাকে (অর্থাৎ তা ত্যাগ করে না), তাদের কাছে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত ও সুসংবাদের) ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় (মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কিয়ামতে) আর বলে, তোমরা (পরকালের) ভয় করো না, (দুনিয়া ত্যাগ করার কারণে) চিন্তা করো না (কেননা, সামনে তোমাদের জন্য এর উত্তম বিকল্প শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে) এবং তোমরা প্রতিশ্রুত জান্নাতের (অর্থাৎ জান্নাত পাওয়ার) কারণে আনন্দিত হও। আমরা তোমাদের সঙ্গী ছিলাম পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও থাকব। (পার্থিব জীবনে ফেরেশতাদের সঙ্গ এই যে, তারা মানুষের অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা জাগ্রত করে।

কষ্ট ও বিপদাপদে ফেরেশতাদের সঙ্গীত্বের প্রভাবেই সবর ও স্থিরতা অর্জিত হয়। পরকালে তারা সামনাসামনি সঙ্গী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ আরেক আয়াতে আছে وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ) যেখানে (অর্থাৎ জান্নাতে) তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি করবে। (অর্থাৎ মুখে যা চাইবে তা পাবেই; মন যা চাইবে, তাও পাবে।) এটা হবে ক্ষমাশীল, করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। (অর্থাৎ এসব নিয়ামত মেহমানদের ন্যায় সসম্মানে ও সাদরে পাওয়া যাবে।) যে আল্লাহ্‌র দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দেয়, (নিজেও) সৎকর্ম করে এবং (আনুগত্য প্রকাশের জন্য) বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তাঁর কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? [যারা আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় এবং সংস্কারমূলক কাজ করে, তারা প্রায়ই মূর্খদের পক্ষ থেকে কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। তাই অতপর তাদেরকে জুলুমের বিপরীতে ইনসাফ এবং অনিষ্টের বিনিময়ে ইষ্ট করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যে শত্রুপক্ষের নির্যাতনে সবর করে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করাই দাওয়াত কার্যকর ও সফল হওয়ার পন্থা। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এতে মুসলমানগণও প্রসঙ্গক্রমে শামিল রয়েছেঃ] ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না; (বরং প্রত্যেকটির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। অতএব) আপনি (অনুসারিগণসহ) সদ্ব্যবহার দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত করুন। তখন দেখবেন, যে ব্যক্তির মধ্যে ও আপনার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (অর্থাৎ মন্দের বিনিময়ে মন্দ করলে শত্রুতা বৃদ্ধি পায় এবং ভাল ব্যবহার করলে শত্রুতা হ্রাস পায়। এমনকি প্রায়ই শত্রুতা সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং শত্রু অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যায়।) এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা (চরিত্রের দিক দিয়ে) খুব দৃঢ় এবং এরূপ চরিত্রের তারাই অধিকারী হয়, যারা (সওয়াবের দিক দিয়ে) অত্যন্ত ভাগ্যবান। যদি (এসময়ে) শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কিছু (ক্রোধের) কুমন্ত্রণা অনুভব করেন. তবে (তৎক্ষণাৎ) আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (মন্দের বিনিময়ে ভাল ব্যবহার করার জন্য প্রতিপক্ষের সুস্থ মনের অধিকারী হওয়া শর্ত। কেননা, মাঝে মাঝে দুষ্টমতি লোকের সাথে ভাল ব্যবহারের উল্টা ফল হতে দেখা যায়। মনের সুস্থতা যারা হারিয়ে ফেলে তাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোরআন, রিসালত ও তওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আযাব তথা

জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে মু'মিন ও কামিলদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। মু'মিন ও কামিল তারাই, যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল পুরোপুরিভাবে শরীয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا -استقامت-এর অর্থ ঃ বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহ্‌কে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে (এটা হল মূল ঈমান) অতপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হল সৎকর্ম)। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে استقامت শব্দের অর্থ বর্ণিত হয়েছে ঈমান ও তওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তফসীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত উসমান (রা) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি استقامت-এর অর্থ করেছেন খাঁটি আমল করা। হযরত উমর (রা) বলেন, الاستقامة ان تستقيم على الامر والنهى ولا تروغ روغان الثعالب -আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম استقامة—(মাযহারী)

তাই আলিমগণ বলেন, استقامت সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্—একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যক্ষ পদক্ষেপেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহ্‌র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ ছাকাফী (রা) একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন, যা শোনার পর অন্য কারও কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন থাকবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, قل امنت بالله ثم استقم—অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর; অতপর তাতে অবিচল থাক।—(মুসলিম) এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।